গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা | ১৯ জুলাই ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com

মার্কিন চক্রান্ত রুখে দেওয়ায় কিউবার জনগণকে অভিনন্দন

এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, সমাজতান্ত্রিক কিউবায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে চেষ্টা সম্প্রতি করা হয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে মনে করে এক মূর্তিমান বিপদ। কারণ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে মার্কিন দাদাগিরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে অনুপ্রেরণা জোগায় কিউবা। আমরা ভুলে যেতে পারি না, কীভাবে সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে ধ্বংস করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বারবার সামরিক অভিযানের চক্রান্ত করেছে, অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত রুখে দেওয়ার জন্য কিউবার জনগণকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের দেশের বহু কষ্টার্জিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বদিক দিয়ে তাঁরা রক্ষা করবেন— এই আশা আমাদের আছে।

বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, শান্তিপ্রিয়, গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, একটা সমাজতান্ত্রিক দেশকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করুন। কিউবার জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান।

ভারতে আমাদের দল ১৪ জুলাই সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতে কিউবার বিরুদ্ধে এই চক্রান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সংগঠিত করবে।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্মরণসভা

বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৯ জুলাই দলের কেন্দ্রীয় অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য (বাঁ দিকে)। কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

বেসরকারিকরণ প্রতিরোধে

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের কনভেনশন

রেল প্রতিরক্ষা ব্যাঙ্ক বিদ্যুৎ ইস্পাত সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ১৮ জুলাই নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোগে সারা বাংলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালনা করেন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা নন্দ পাত্র। শুরুতে প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকার তাঁর বক্তব্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী পদক্ষেপগুলি তুলে ধরে সমস্ত মানুষকে সতর্ক করেন। তিনি নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আন্দোলনগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারস ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শৈলেন দুবে, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের সহ সভাপতি গৌতম মুখার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভিনেতা ও পরিচালক কৌশিক সেন, ব্যাঙ্ক সংগঠনের জগন্নাথ রায় মণ্ডল, ইস্পাত শিল্প শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অমর চৌধুরী। সব শেষে মঞ্চের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা অশোক দাস রাজ্যবাসীকে আন্দোলনের আহ্বান জানান।

বিজেপির হাতিয়ার ব্রিটিশ আমলের কালা আইন

'প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি, অন্যায় করে কেন হয় না'ক রাজাও প্রজাদ্রোহী!'— প্রশ্ন করেছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম।

দেশের নাগরিকদের জীবনের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা না দেখানো সরকারের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন করলেই একের পর এক সাংবাদিক, সমাজকর্মী, প্রতিবাদী ছাত্র-যুবক মহিলা সহ বহু মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া, দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়ার যে সর্বনাশা ক্রিয়াকলাপ বিজেপি সরকার চালাচ্ছে তাতে এই প্রশ্ন আজ আবার নতুন করে উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন একটা অপদার্থ এবং জনবিরোধী সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অধিকার নাগরিকদের থাকবে না? আর এ কথা বললেই কেন তা 'রাজদ্রোহ' হবে?

সম্প্রতি সরকারের সমালোচক, আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে লড়াই করা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ফাদার স্ট্যান স্বামীকে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বন্দি অবস্থায় যে ভাবে সরকার কার্যত হত্যা করেছে, তারপর এই প্রশ্ন আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালতকে পর্যন্ত এই প্রশ্ন তুলতে হয়েছে— স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ব্রিটিশ আমলের 'রাষ্ট্রদ্রোহ' (সিডিশন) আইন চালু রাখার প্রয়োজন কী। ১৫ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে ১২৪-এ ধারাকে (রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত আইন) চ্যালেঞ্জ করে এক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারের দায়ের করা মামলায় এ কথা বলেছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি। এই 'রাষ্ট্রদ্রোহ' আইন যে প্রতিবাদ দমনে সরকারের হাতে একটা প্রধান হাতিয়ার তা আজ সারা দেশের মানুষ জানে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের মুখপাত্র অ্যাডভোকেট জেনারেল পর্যন্ত

দুয়ের পাতায় দেখুন

ব্রিটিশ আমলের কালা আইন

একের পাতার পর

এই সত্যকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই তিনি একটু নরম সুরে আদালতে বলেছেন, আইনটা একেবারে বাতিল না করে এ ব্যাপারে একটা গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া হোক, যাতে অপব্যবহার না হয়। প্রশ্নটা কিন্তু ব্যবহার অপব্যবহার নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হল, ব্রিটিশ সরকারের তৈরি ১৮৬০ সালের রাজদ্রোহ (সিডিশন) আইন আজও কার্যকরী রাখা হবে কেন? ব্রিটিশ সরকার আইন করেছিল, সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ, অসন্তোষ কিংবা আনুগত্যের অভাবই হল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। যে কোনও লেখা, বক্তব্য বা বিক্ষোভ যা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি করে, কোনও বিক্ষোভ যদি সরকার বদলের ডাক দেয় তাহলেও তা এই আইনের কোপে পড়তে পারে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি হল যাবজ্জীবন কারাবাস। স্বাধীন ভারতেও এই আইন সমানে কার্যকরী আছে। তার সুযোগে যে কোনও প্রতিবাদীকেই রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দেশদ্রোহী বলতে পারছে সরকার। আদালতে এর ফয়সলা কী হবে, তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু আদালতের দিকে তাকিয়ে বসে না থেকে আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই আইন বাতিলের দাবিকে জোরদার করা দরকার।

এই বছর ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের শুরু পর্যন্ত একাধিক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নানা বেঞ্চও মত দিয়েছে যে, সরকারের সমালাচনাকে রাজদ্রোহ, দেশদ্রোহ বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের বাকস্বাধীনতা রক্ষার কথাও বিচারপতিরা বলেছেন। শীর্ষ আদালতের একটি বেঞ্চ এমনও বলেছে, রাষ্ট্রদ্রোহ কাকে বলে তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দরকার। যদিও এই সব রায় এবং পর্যবেক্ষণে রাষ্ট্রদ্রোহের মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত প্রায় চারশোর বেশি মানুষ যাঁদের অনেকে সাংবাদিক এবং সমাজকর্মী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী, তাঁদের কোনও উপকার হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই।

কারণ, কথায় কথায় প্রতিবাদীদের রাজদ্রোহ আইনে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে বিজেপি সরকার প্রায় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনে এক বছরের বেশি জেলবন্দি থাকা জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সিএএ বিরোধী প্রতিবাদীদের জামিন দিতে গিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে, প্রতিবাদ আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সীমারেখাটাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে সরকার।

২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হওয়ার পর থেকে ৭ হাজার ১৫০ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করা, বিক্ষোভে গাড়ির কাচ ভাঙা— এই ধরনের অভিযোগও আছে। সরকার বা কোনও নেতা-মন্ত্রীর সমালোচনা করার অপরাধে ৪০৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করায় মামলা হয়েছে ১৪৯ জনের বিরুদ্ধে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হয়েছেন ১৪৪ জন। সিএএ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ২৫ জন, হাথরস ধর্ষণ কাণ্ডে সরকারের সমালোচনা করায় ২২ জন, পুলওয়ামায় সরকারের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তোলায় ২৭ জন— রাষ্ট্রদ্রোহ এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনে অভিযুক্ত (দ্য লিফলেট, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মিহির দেশাইয়ের প্রবন্ধ, ১০ জুন ২০২১)। রাষ্ট্রদ্রোহ আইন এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনকে সরকার ব্যবহার করছে শুধু বিরোধীদের জেলবন্দি করে রাখার জন্য। তার প্রমাণ, ২০১৪-'১৯— এই পাঁচ বছরে মাত্র ছ'জনের শাস্তি হয়েছে। বেশিরভাগ মামলায় চার্জশিটও হয়নি। এমনকি কাশ্মীরেও কোনও চার্জশিট পাঁচ বছরের মধ্যে দিতে পারেনি পুলিশ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ২০২১)। উত্তরপ্রদেশের মানবদরদী চিকিৎসক কাফিল খান সিএএ-র বিরোধিতা করে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দীর্ঘ কারাবাসের পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন। এরপরেও তাঁকে নানা মামলায় হেনস্থা করছে বিজেপি সরকার, কারণ তিনি উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম গলদ ধরিয়ে দিয়েছিলেন জনসমক্ষে। আদালত অপাতত তাঁকে রেহাই দিলেও সরকার যে রেহাই দিতে নারাজ তা নানা ঘটনাক্রমে পরিষ্কার। হাথরসে ধর্ষণকাণ্ডের খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিক কাপ্পান সিদ্দিকি আজও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ মাথায় নিয়ে জেলে। তাঁর মামলার ফয়সালা শীর্ষ আদালত কবে করবে তা কেউ জানে না। বিজেপি সরকারও মামলাটা ঝুলিয়ে রাখতেই তৎপর। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হয়েছেন এক সাংবাদিক। বর্ষীয়ান সাংবাদিক বিনোদ দুয়া কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে এবং ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি গণহত্যায় বিজেপি সরকারের ভূমিকাকে সমালোচনা করে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি গণহত্যায় উস্কানিদাতা বিজেপি নেতাদের দিকে পুলিশ আঙুল তোলার সাহস পায়নি। কিন্তু সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের এর জন্য দায়ী করে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থন করায় পরিবেশ-কর্মী তরুণী দিশা রবি সহ একাধিক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ২০১৯ সালে ১৩৯ জনের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ)-তে মামলা করা হয়েছে। এর অর্ধেকই হচ্ছে গো-রক্ষার অজুহাতে। সম্প্রতি দিল্লিতে ভ্যাকসিন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে পোস্টার মারার 'অপরাধে' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশ বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজ্যে রাজ্যে বিশেষত উত্তরপ্রদেশে প্রতিবাদকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এমনকি তাদের যথেচ্ছ জেলে ভরার আইন তৈরি হয়েছে। করোনা মহামারি রোধে সরকারের ব্যর্থতার যে কোনও সমলোচনাকেই উত্তরপ্রদেশের পুলিশ 'ফেক নিউজ' রোখার অজুহাতে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়ে দমন করছে। দেশের যে পাঁচটি রাজ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার শীর্ষে আছে তার চারটিই সরাসরি বিজেপি শাসিত। রাজ্যগুলি হল বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড এবং তামিলনাড়ু। আজ ভারতবাসীকে দেশপ্রেমের পাঠ দিচ্ছেন আরএসএস-বিজেপি নেতারা। এই আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিশ্বাসঘাতক, প্রতিক্রিয়াশীল বলেছে এবং ব্রিটিশের দালালি করেই চলেছে। তার আদর্শে পুষ্ট বিজেপি অন্যায়ের প্রতিবাদকে দেশদ্রোহিতা বলবে এ নতুন কথা কী? তাই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে কিছুটা আশার সৃষ্টি হলেও বেশিরভাগ প্রশ্নের মীমাংসা এতে হচ্ছে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লোকমান্য তিলক থেকে শুরু করে শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এই আইনে জেল খাটিয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী কবিতা লেখার অপরাধে জেল খেটেছেন কাজি নজরুল ইসলাম। গান্ধীজিও এই আইনে বন্দি হয়েছেন। এই আইনকে গান্ধীজি বলেছিলেন পেনাল কোডের 'রাজা' যা মানুষের স্বাধীনতা হরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। স্বাধীনতার পর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির বহু সদস্যই এই আইন বাতিলের জন্য সওয়াল করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তা বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করেননি। পঞ্চাশের দশকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং পাঞ্জাব হাইকোর্ট এই আইনকে অসাংবিধানিক বলে। কিন্তু ১৯৬২ সালে কেদারনাথ সিং বনাম বিহার সরকারের মামলায় রাজদ্রোহ আইনকে সিলমোহর দেয় সুপ্রিম কোর্ট। যদিও সেই রায়েও আদালত বলেছিল সরকারের সমালোচক এবং সাংবাদিকদের উপর এই আইন যাতে প্রযুক্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু যত দিন গেছে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে সরকারগুলি ক্রমাগত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার জন্য সক্রিয় হয়েছে। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজদ্রোহকে শাস্তিযোগ্য (কগনাইজেবল) অপরাধ হিসাবে পেনাল কোডে নতুন করে ফিরিয়ে আনেন। উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত প্রগতিশীল এবং প্রতিবাদী মানসিকতার উপর লাগাম পরানো। সেদিন বামস্থার প্রতি, সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থেকে শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়াতে চাইছিল, ফেটে পড়ছিল আন্দোলন। এই আন্দোলনকে টুঁটি টিপে মারার হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল কংগ্রেস সরকার। তারপর যত দিন গেছে কংগ্রেস একের পর এক দমনমূলক আইন দেশের মানুষের উপর চাপিয়েছে। ইউএপিএ-র মতো চরম স্বৈরাচারী আইন তারাই চাপিয়ে গেছে। আজ বিজেপি ক্ষমতায় এসে এই গণতন্ত্র হরণের প্রচেষ্টাকে চরম জায়গায় নিয়ে গেছে। পুঁজিবাদের নিয়মেই যত বেশি বেশি করে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকের হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তত বাড়ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট। ততই বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাও গণতন্ত্রের বাইরের ঠাটবাটটুকু বজায় রেখে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যের দিকে ঝুঁকছে। দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশেই এটা ঘটছে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই ভারতের শাসকরাও পুঁজিপতিশ্রেণির চরম শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষাকে নিরঙ্কুশ করতে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত কেড়ে নেওয়ার পথে চলছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা তার সূচনাপর্বে গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ— আইন বিভাগ, সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনযন্ত্র এবং বিচার বিভাগের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু রেখেছিল বুর্জোয়া ব্যবস্থা যত সংকটাপন্ন হয়েছে তত সে সীমারেখা ঘুচে গেছে। অন্য সব বিভাগের আপেক্ষিক স্বাধীনতা গিলে খেয়েছে রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র। বিচারব্যবস্থা তার আপেক্ষিক স্বাধীনতা অনেকাংশেই হারিয়েছে।

আশার কথা, শাসক শ্রেণি চাইলেও এর বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রতিবাদের শক্তিকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। আদালতের এই রায় আসতে পেরেছে এই প্রতিবাদের শক্তি এখনও কার্যকরী বলেই। একটা কথা আজ পরিষ্কার বুঝতে হবে বিচারবিভাগের থেকেও যদি গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা আদায় করতে হয়, তাহলে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। না হলে বিচারবিভাগের আপেক্ষিক স্বাধীনতাটুকুও রক্ষিত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি, প্রতিবাদের শক্তি বাড়লে তবেই বিচারব্যবস্থার কাছ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সদর্থক কিছু রায় অন্তত মানুষ আদায় করতে পারবে। আজও যে প্রতিবাদীরা জেলে পচছেন তাঁদের মুক্ত করতে গেলেও আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিকে আরও জোরদার করতে হবে।

মানবাধিকার কর্মীরা আক্রান্ত

পূর্ব বর্ধমান জেলার বৈকণ্ঠপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোরিয়া গ্রামের মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সদস্যরা শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত। গত দু'বছর ধরে এই সদস্যরা কোরিয়া গ্রাম এবং সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে গ্রামের সমাজবিরোধীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। বিভিন্নভাবে এই সদস্যদের সামাজিক কাজ থেকে বিরত করার চেষ্টা ক্রমাগত চলতে থাকে। গত ২৮ জুন সংগঠনের সম্পাদক শেখ সৌরভ ও আরেকজন কর্মীকে প্রচণ্ড মারধর করে দুষ্কৃতীরা। এরই প্রতিবাদে মহকুমা শাসক এবং এলাকার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে থানা অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করে। এরপরেও দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মানবাধিকার কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গালিগালাজ করে ও মেয়েদের শ্লীলতাহানি সহ প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ শক্তিগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত এই কর্মীদের জীবন রক্ষার অনুরোধ করেন। পুলিশ আধিকারিকের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সহ সম্পাদিক সুচেতা কুণ্ডু অভিযুক্ত দুষ্কৃতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

সমাজকে বাদ দিয়ে কেউ একা একা মুক্তি অর্জন করতে পারে না

শিবদাস ঘোষ

আগামী ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৬তম মৃত্যু দিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষার কিছু অংশ গণদাবীর পাতায় আমরা তুলে ধরছি— সম্পাদক, গণদাবী

বিপ্লবীদের মনে রাখতে হবে, বিপ্লবীর সংগ্রাম সর্বত্র। তার 'এগজিসটেন্স'টাই (অস্তিত্বটাই) সংগ্রাম। সে সবসময় একজন বিপ্লবী হিসাবে সচেতনভাবে অবস্থান করে। কী সেই সচেতনতা? না, সে এইটা বুঝতে পেরেছে যে, তার বিকাশ, তার মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের প্রগতি এবং বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত। সমাজের প্রগতি ব্যাহত হলে, সমাজ পরিবেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তারও বিকাশ ব্যাহত হয়। তারও পরিবারে তার ছায়া পড়ে। গোটা সমাজকে বাদ দিয়ে সে একা একা মুক্তি অর্জন করতে পারে না। একা একা মুক্তি অর্জনের রাস্তা অধ্যাত্মবাদীদের, যারা সংগ্রামের ময়দানে এসেছে তাদের নয়, বিপ্লবীদের নয়। আর একটা কথাও এখানে বুঝতে হবে। তা হচ্ছে, আমরা যে বলি, সমাজের অগ্রগতির স্বার্থের সাথে প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থ, উন্নতির স্বার্থ, সবকিছুর স্বার্থ জড়িত— এই ধারণাটিও ভাসাভাসা— যদি না বুঝতে পারা যায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোন সেই শ্রেণি, যে শ্রেণি শোষিত শ্রেণিগুলির অগ্রণী বা নেতা শ্রেণি— যে শ্রেণির মুক্তির স্বার্থের সঙ্গে, প্রগতি-উন্নতি ও স্বাধীনতার স্বার্থের সঙ্গে গোটা সমাজের প্রগতি, উৎপাদনের উন্নতি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও সংস্কৃতির, প্রগতির স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইটা বুঝলেই বুঝতে পারা যাবে, যেহেতু সেই বিশেষ শ্রেণির মুক্তির প্রশ্ন, স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং সেই শ্রেণির সংগ্রাম ও নেতৃত্বের প্রশ্নের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তির প্রশ্ন জড়িত, সেই কারণেই যে শ্রেণিসংগ্রাম গোটা সমাজকে সেই বিশেষ শ্রেণির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে একজন বিপ্লবী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

এটাই হচ্ছে আজকের সমাজের যথার্থ 'রিকগনিশন অব নেসেসিটি' (প্রয়োজনের উপলব্ধি)। এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি বলতে একজন ব্যক্তির নিজের খাওয়া-পরার, চাকরি-বাকরির বা তার নিজের একটা ঘর গোছানোর প্রয়োজন বোঝায় না। বিপ্লবীদের প্রয়োজনবোধ এটা নয়। প্রতিটি মানুষের সত্যিকারের যা প্রয়োজন, সমাজের যা যথার্থ প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রগতিশীল বিপ্লবী শ্রেণির যা যথার্থ প্রয়োজন— যে প্রয়োজন থেকে সামাজিক একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, বিপ্লবীর প্রয়োজনবোধ হচ্ছে তাই। যে মানুষ ব্যক্তিবাদ থেকে, কূপমণ্ডুকতা থেকে বা স্বার্থবাদ এবং প্রবৃত্তির তাড়না, যা তার নিজের মধ্যেই রয়েছে, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায় সে একা একা লড়ে এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। কারণ আজকের শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিচিন্তার যে প্রভাব রয়েছে তার ফলেই, সমাজব্যবস্থার প্রভাবের ফলেই তার মধ্যে এগুলি দেখা দিচ্ছে। ফলে যে শ্রমিক শ্রেণি এইগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সমস্ত সমাজকে মুক্ত করতে চাইছে, সেই শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে আজকে যদি গোটা সমাজের উৎপাদনের প্রগতির প্রশ্ন, বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্ন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পুঁজিবাদী শোষণের জুলুম ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্নও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তা হলে এই মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধিই হল ব্যক্তির মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি। এই প্রয়োজন উপলব্ধির থেকেই সমাজে একজন মানুষ বিপ্লবী হচ্ছে।

তা হলে সমাজে একজন বিপ্লবীর অবস্থান কী? না, সমাজে সে এমন একটি চেতনসত্ত্বা হিসাবে অবস্থান করছে যে, সমস্ত সমাজ পরিবেশের মধ্যে, বস্তু পরিবেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যথার্থ স্বরূপটি অনুধাবন করতে পেরেছে এবং সে ধরতে পেরেছে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কোন কোন দু'টি মূল বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রগতির গতি নির্ধারিত হচ্ছে। যে সময়ে প্রগতির গতি নির্ধারিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা, সেই সময়ে একজন ব্যক্তির উন্নতি, তার স্বাধীনতা এবং সত্যিকারের প্রয়োজনের চেতনা, মুক্তির প্রয়োজনের চেতনা ছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার সমস্বার্থবোধ। তখন সেই স্বাধীনতার প্রয়োজনবোধই ছিল তার যথার্থ প্রয়োজনবোধের উপলব্ধি, তার যথার্থ সমাজচেতনার এবং শ্রেণিচেতনার প্রকাশ। আবার আজকের সমাজে একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর একদিকে শোষিত শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হচ্ছে মূল সংঘাত বা আজকের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব— যে দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিসত্ত্বা আবর্তিত হচ্ছে। এই মূল সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির বিজয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারা শ্রেণির গণতন্ত্র, উৎপাদন-শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-নৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া একাধিপত্যের জায়গায় সর্বহারা শ্রেণির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রগতির পথ নির্দেশিত হচ্ছে। এই অবস্থায় আজকের সমাজে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধির সঙ্গে যখন একজন ব্যক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধি একীভূত হয়েছে তখনই সে বিপ্লবী।

সুতরাং এই সমাজে একজন বিপ্লবী অবস্থান করছে মানেই সে বুর্জোয়া শ্রেণি এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবস্থান করছে। এই বিরোধ শুধুমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয়— ঘরে-বাইরে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়, রুচিতে সর্বত্র এই বিরোধ। ফলে একজন বিপ্লবীর কাছে ভাল লাগা বা রুচির ধারণা হচ্ছে তা-ই যা বিপ্লবের পরিপূরক, যা শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক, যা উৎপাদনকে, শিল্পকে, সাহিত্যকে, বিজ্ঞানকে বুর্জোয়া 'প্রি-কনসেপশন' (পূর্বধারণা) থেকে মুক্ত করার পরিপূরক। একজন বিপ্লবীর ভাল লাগা বা রুচির ধারণা— বুর্জোয়ার উপলব্ধি, তার সংস্কৃতি, তার সৌন্দর্যবোধ, তার পরিবারের ধারণা, তার ভালবাসার ধারণা, তার যৌন স্বাধীনতার ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই হল বিপ্লবীর যথার্থ অবস্থান।

তা হলে বিপ্লবী এইভাবে অবস্থান করে। সে অবস্থানই করছে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে। এই সংগ্রামের পরিকল্পনার মধ্যে কতকগুলি রুটিন ওয়ার্ক আছে। সেই রুটিন ওয়ার্ক একমাত্র তারাই সহ্য করতে পারে যারা শ্রেণিসচেতন, যারা মূল লক্ষ্যটা ধরতে পেরেছে। এই মূল লক্ষ্যটাকে গড়ে তোলবার জন্যই দীর্ঘদিন ধরে একটা পরিকল্পনায় বিপ্লবীদের কাজ করতে হয়। এলোমেলোভাবে যদি বিপ্লবীরা কাজ করে তাহলে সুসংগঠিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তারা ভাঙতে পারবে না। আমরা শুধু তার পুলিশকে দেখছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই পুলিশই সব নয়। আক্রমণে শেষ মোকাবিলা করতে হবে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সব থেকে সুসংগঠিত রাষ্ট্রের আর্মি বা মিলিটারির সঙ্গে। সেই শেষ মোকাবিলার আগে প্রয়োজনীয় জনশক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী আন্দোলন চালাবার মতো সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য বিপ্লবীদের লড়াই শুরু করতে হয় ঘরে-বাইরে, নিজের মধ্যে, আদর্শের ক্ষেত্রে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে, রুচির ক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সর্বত্র। তাই মাও সে তুঙ-ও বলেছেন, যে কোনও বিপ্লবের পরিপূরক সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব সেই বিপ্লবের আগে শুরু করতে হয়। এ কথার অর্থ, প্রতিক্রিয়াবাদীরাই হোক আর প্রগতিশীল বা বিপ্লবীরাই হোক— একে অপরকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে, সত্যিকারের ক্ষমতাচ্যুত করবার সেই লড়াইটি গড়ে উঠবার আগে দীর্ঘদিন ধরে আদর্শগত ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের প্রচার এবং কাজ করে যেতে হয়। এই কাজটি এড়িয়ে গিয়ে মূল লড়াইতে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর এই কাজটিই হচ্ছে খুব কঠিন। যখন কোনও গরম বা ফিভার সৃষ্টি করার মতো লড়াই নেই তখন দিনের পর দিন প্রবল নিষ্ঠা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে রুটিন ওয়ার্ক চালিয়ে যেতে পারা, সংগঠন গড়ে তোলবার জন্য কষ্টসাধ্য সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতে পারা একমাত্র একজন প্রকৃত সচেতন বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব। আমি আগেই বলেছি, দীর্ঘদিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবী সচেতনতা গড়ে তোলবার সংগ্রামে যারা আসেনি, দিনের পর দিন রুটিন ওয়ার্কের মতো কঠিন সংগ্রাম করবার কোনও ক্ষমতাই যাদের নেই, তারাও মাঠে-ময়দানে যখন লড়াইটা চলে তখন সে লড়াইতে কত সহজে এসে যায়— যাকেই আমরা ভুল করে একমাত্র স্ট্রাগল বলে মনে করি। আর প্রতিদিন রুটিন ওয়ার্ক চালিয়ে যাওয়াটা, আমরা মনে করি, স্ট্রাগল নয়। অথচ বিচার করলে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন ধরে এই রুটিন ওয়ার্কের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন। এর জন্য চাই চরিত্রের বল, চাই আদর্শের নিষ্ঠা, চাই সমস্ত জিনিসটাকে সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

তা হলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রুটিন ওয়ার্কটা দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কাজ এবং এটাও স্ট্রাগলেরই একটা রূপ। ফলে পার্টির কাজ সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা হবে এটা বিচার করে দেখা যে, রুটিন ওয়ার্কটা কেবলমাত্র কতকগুলো বাঁধাধরা ছকে হচ্ছে, নাকি তার মধ্যে প্রতিনিয়ত জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলবার একটা পরিকল্পনা আছে। জনগণের সঙ্গে সংযোগের ভিত্তিতে কাজ করার এই প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কনট্রাডিকশন আছে, তার টারময়েল (তীব্র মানসিক আলোড়ন) আছে এবং বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিত্যনতুন প্রক্রিয়ায় তাকে গড়ে তোলবার জন্য আন্দোলন আছে। আন্দোলন বলতে শুধু বাইরের একটা স্লোগান দেওয়া, মিছিল, মিটিং, ব্যারিকেড করে লড়াই, পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি এবং ক্ষমতা দখল করা নয়। এগুলো সবই আন্দোলনের এক একটা রূপ— চেতনার স্তরভেদে, সংগঠনের স্তরভেদে রূপভেদ। চেতনার স্তর, সংগঠনের স্তর, গণসমাবেশের স্তর এবং আক্রমণের ধারা এবং রীতি এই কয়েকটা জিনিস মিলে এই লড়াইয়ের ঢংগুলো, ফর্মগুলো— অর্থাৎ কোনটা কোন ফর্মের লড়াই, কোন সময়ে কোন লড়াইটা হবে তা পালটে যায়।

আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা, ডিবেট করা, লোককে বোঝানো, বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধে ফাইট করা, ইউনিয়ন গড়া, কলেজ ইউনিয়ন চালানো, রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করা, পোস্টারিং করা, ডোর-টু-ডোর অ্যাপ্রোচ করা, বিরুদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত করে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মতবাদ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলার জন্য ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে পেইনস্টেকিং (কষ্টসাধ্য) আলোচনা চালিয়ে যাওয়া— এগুলো সবই সংগ্রামের বিভিন্ন বিচিত্রতর এবং জটিলতর রূপ। এই সংগ্রামে যে কর্মী নিয়োজিত সে কখনও আপন নিয়মে কাজ করে না। সে 'কালেকটিভে'র (যৌথ নেতৃত্বের) প্রোগ্রাম অনুযায়ী খুশি মনে কালেকটিভের সঙ্গে মিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এই কাজটি করে।

(যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক)

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী মতলব ব্যর্থ করে দিল কিউবার মানুষ

সমাজতান্ত্রিক কিউবা দ্বীপরাষ্ট্রটি দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার চক্ষুশূল। গত ৬০ বছর ধরে কিউবার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে রেখেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। নানা ভাবে দেশটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা ব্যর্থ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও অর্থনীতি, সর্বোপরি দেশের মানুষের সমর্থনকে পুঁজি করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কিউবা। সম্প্রতি সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করে কিউবার সুস্থিতি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ১১ জুলাই সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে পুষ্ট কিছু 'বিক্ষোভকারী' রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায়, সমাজতন্ত্রবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। এতটুকু সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থন করে বিবৃতি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার সাম্রাজ্যবাদী স্যাঙাৎ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো। কিন্তু কিউবার সমাজতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণ দেশের প্রেসিডেন্টের ডাকে বিপুল সংখ্যায় পথে বেরিয়ে এসে তথাকথিত সেই বিক্ষোভ প্রতিহত করে। সরকার সমর্থক জনতার স্রোত দেখে আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে গুণ্ডারা পালিয়ে বাঁচে। আরও একবার ব্যর্থ হয় কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র।

অর্থ, অস্ত্র সহ সমস্ত রকমের সাহায্য দিয়ে প্রথমে দেশের মধ্যে বিক্ষোভকারী গোষ্ঠী তৈরি করা, তাদের দিয়ে দেশের সুস্থিতি বিপন্ন করা এবং তারপর 'স্বৈরাচার দমন' কিংবা 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' ধুয়ো তুলে সেখানে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি চালিয়ে পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেদার লুটপাট চালানো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি পুরনো কৌশল। এই কৌশল ব্যবহার করে সে ও তার স্যাঙাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো সমৃদ্ধ দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন দুর্বিষহ করে দিয়েছে। লাতিন আমেরিকাতেও নিজের আধিপত্য বিস্তারে প্রবল সচেষ্ট মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ২০০৪ সালে কিউবারই প্রতিবেশী দেশ হাইতিতে হামলা চালিয়ে সেখানকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে হঠিয়ে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আজ হাইতির মানুষ প্রবল দারিদ্র, আর্থিক অসাম্য, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হানাহানির মুখে পড়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

এই লাতিন আমেরিকাতেই ১৯৫৯ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র চোখে চোখ রেখে সেখানকার মানুষ ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে সমাজতান্ত্রিক সরকার। সেই থেকে ওই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিউবা। শুরু থেকেই আমেরিকা দাঁতে-নখে পিষে মারার চেষ্টায় কসুর করেনি এই ছোট্ট দেশটিকে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ, অর্থনৈতিক অবরোধ, জীবাণু যুদ্ধ সহ বহুবার কিউবা বিপ্লবের নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা— কিউবাকে হাতের মুঠোয় পুরতে কী না করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নির্দেশে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কুখ্যাত সিআইএ কিউবার উদ্বাস্তুদের একটি গোষ্ঠীকে গোপন ট্রেনিং দিয়ে ১৯৬১ সালের ১৪ এপ্রিল কাস্ত্রো সরকার উচ্ছেদে হানাদারি চালিয়েছিল, যেটি 'বে অফ পিগস অভিযান' নামে পরিচিত। কিন্তু সে অপচেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়। এই অতিমারি পরিস্থিতিতেও অবরোধ তুলে নেওয়া দূরে থাক, ক্রমাগত আরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্য দেশকেও কিউবার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা দিয়ে চলেছে আমেরিকা। গত চার বছরে আমেরিকা কিউবার বিরুদ্ধে নতুন করে ২৪০ রকমের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছে, যার জেরে সে দেশের মানুষকে বর্তমানে অত্যন্ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সাহায্যে কিউবার উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলির ঈর্ষার কারণ। মার্কিন কোম্পানির বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই ছোট্ট দেশ নিজেরাই কোভিড প্রতিরোধে কার্যকরী ভ্যাক্সিন তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, গত বছর কোভিড বিধ্বস্ত ৫৯টি দেশে মেডিক্যাল টিম পাঠিয়ে স্বাস্থ্য-সহযোগিতার অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে সমাজতান্ত্রিক কিউবা।

কিন্তু দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে চলা অর্থনৈতিক অবরোধের জেরে ও সাম্প্রতিক অতিমারির কারণে পর্যটন শিল্পে ভাটা আসার দরুণ বাস্তবিকই কিউবার মানুষ আজ কিছুটা সমস্যার মুখোমুখি। দেশে খাদ্যভাণ্ডারের পরিমাণ কমে আসছে, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সবসময় মিলছে না, এমনকি বিদ্যুৎ সঙ্কটও দেখা দিচ্ছে। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাম্রাজ্যবাদী লুটপাটের স্বার্থে সংকটের এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন। সমস্যায় জেরবার কিউবার মানুষের একাংশের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এই সময়টাকেই তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চাগিয়ে তুলে দেশের সুস্থিতি বিপন্ন করার অপচেষ্টায়। সাম্রাজ্যবাদী চেলা-চামুণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচিত সরকার ফেলে দিয়ে কিউবাকে যদি হাতের মুঠোয় এনে ফেলা যায়, তাহলে গোটা লাতিন আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারের পথ অনেকটাই মসৃণ হয় আমেরিকার কাছে। সেই লক্ষ্যেই বিপুল অঙ্কের ডলার খরচ করে, কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-কে কাজে লাগিয়ে কিউবার মধ্যে তারা গড়ে তুলেছে বিক্ষুব্ধ মানুষদের একটা গোষ্ঠী। কিউবা থেকে নির্বাসিত দক্ষিণপন্থী একটি গোষ্ঠী সহ আরও কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী সহায় হয়েছে তাদের। ১১ জুলাই-এর তথাকথিত এই বিক্ষোভকে কিউবার সমাজতান্ত্রিক সরকারবিরোধী জনগণের বিক্ষোভ বলে তুলে ধরতে তাই চেষ্টার কসুর করেনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ তার অপকর্মের সঙ্গী দেশগুলি। তাই এই বিক্ষোভকে সমর্থন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিবৃতির পরে পরেই ব্রাজিলের দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো বিক্ষোভকারীদের প্রতি সংহতি প্রদর্শনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, কিউবা নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসনে নিষ্পেষিত হচ্ছে। মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর একটি অংশ এগিয়ে এসে বলতে থাকে কিউবার মানুষের সাহায্য প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিউবার সরকার ও জনগণের। ওই দিনই প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-কানাল টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার আহ্বান জানান দেশবাসীর কাছে। ভাষণে তিনি প্রশ্ন করেন, কিউবার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি এতই যদি দরদ আমেরিকার, তাহলে একের পর এক অবরোধ চাপিয়ে তাদের টুঁটি টিপে ধরছে কেন তারা! সাম্রাজ্যবাদের এই ভাড়াটে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক মানুষকে পথে নামার আবেদন জানান তিনি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাতারে কাতারে সমাজতন্ত্রপ্রিয় কিউবাবাসী জাতীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে আসে। মুখে তাদের বিপ্লবের নামে জয়ধ্বনি। গান গেয়ে, স্লোগান তুলে তারা ঘোষণা করে— স্বাধীন কিউবাকে রক্ষার জন্য আমাদের সবটুকু দিয়ে দিতে রাজি আছি। বলেছে, ফিদেল আমরা তোমার। আর এইসব রাস্তা আমাদের। আমরা জিততে এসেছি। জয় আমাদের হবেই। ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সরকারের সমর্থনে স্লোগান দিয়েছেন মহিলারা। গলা মিলিয়েছে রাস্তার মিছিলে। তথাকথিত বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত কিউবার শ্রমিক সংগঠনের এক নেতা বলেছেন, ওদের আক্রমণে আমার মাথায় সাতটা সেলাই পড়েছে। কিন্তু রক্তমাখা পতাকা হাতে নিয়ে এই মিছিলে আমি হাঁটব বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য। কারণ আমি জানি দেশের জন্য মৃত্যু মানে আসলে জীবন লাভ করা।

সমাজতন্ত্র রক্ষায় দৃঢ়পণ দেশপ্রেমিক মানুষের স্রোতে এ দিন খড়কুটোর মতো ভেসে যায় সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে গুণ্ডারা। আশ্রয় নেয় তাদের গোপন ডেরায়। গোটা দুনিয়ার মানুষ একযোগে ধিক্কার জানায় কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে। দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে পা মেলায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

ভারতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে ১৪ জুলাই প্রতিটি রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলে স্লোগান ওঠে, অবিলম্বে কিউবায় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়— সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার শাসক শ্রেণির সাথে ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠতা দেশের মানুষ মেনে নেবে না।

কিউবার সংগ্রামী মানুষের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন

হরিয়ানার রোহতকে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান

কলকাতায় মার্কিন তথ্যদপ্তরের সামনে বিক্ষোভ। কুশপুতুলে আগুন দেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। কমিউন গুণগত ভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কমিউন শাসনে এই প্রথম শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

কিন্তু নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ৭২ দিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কমিউনকে ধ্বংস করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মানবমুক্তির দিশারী কার্ল মার্কস তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন, সমৃদ্ধ করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য-প্রয়োজন। প্যারি কমিউনের এই মহান সংগ্রামের ইতিহাস জানা সমস্ত মার্কসবাদীর অবশ্য-কর্তব্য।

আগের পাঁচটি কিস্তিতে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন, পুনরায় বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা দখল, ১৮৩০-এ জুলাই বিদ্রোহে অর্লিয়ানিস্ট বংশের লুই ফিলিপের ক্ষমতা দখল এবং ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবিধান পরিষদ থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিতাড়ন এবং ২২ জুন শ্রমিক শ্রেণির বিদ্রোহকে নৃশংস ভাবে দমনের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখল ও সম্রাটতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ফ্রান্স-প্রুশিয়ার যুদ্ধ, নেপোলিয়নের পতনের কথা আলোচিত হয়েছে। এ বার ষষ্ঠ কিস্তি। — সম্পাদক, গণদাবী

৬

প্যারিসের মানুষ কিন্তু জার্মানির বিসমার্ক আর ফরাসি শাসক তিয়েরের মধ্যে হওয়া সন্ধিচুক্তিটাকে ফরাসি জাতির প্রতি জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবেই দেখে। শ্রমিক নেতাদের বেশিরভাগই তখন ৩১ অক্টোবরের বিক্ষোভের জেরে বন্দি হয়ে জেলে। প্রুশীয়রা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে প্যারিসের দিকে। সেই সময় তিয়ের, ত্রশ্যুর মতো নেতাদের ক্ষমতা দখলটাকে প্যারিসের মানুষ মেনে নিয়েছিল পরিষ্কার এই শর্তে যে, একমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। প্যারিস রক্ষা করতে হলে কিন্তু তার শ্রমিক শ্রেণিকে অস্ত্রসজ্জিত করা, কার্যকরী শক্তি হিসাবে তাদের সংগঠিত করা, যুদ্ধের ভিতর দিয়েই তাদের সুশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া চলে না। অথচ অস্ত্রসজ্জিত প্যারিস মানেই অস্ত্রসজ্জিত বিপ্লব। প্রুশীয় আক্রমণকারীদের উপর প্যারিসের জয়লাভের অর্থ ফরাসি পুঁজিপতি ও তাদের রাষ্ট্রীয় পরগাছাদের উপর ফরাসি শ্রমিক শ্রেণির বিজয়। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণি-স্বার্থের এই সংঘর্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না জাতিদ্রোহী সরকার হয়ে উঠতে।

আসলে শুরু থেকেই এই সরকারের গোপন পরিকল্পনা ছিল প্যারিসকে আত্মসমর্পণ করানোর। আর এই ষড়যন্ত্র আড়াল করতে প্যারিসের শাসনকর্তা ত্রশ্যু এবং পররাষ্ট্র সচিব জুল ফাভর ক্রমাগত আস্ফালন করে গেছে, 'কখনওই আত্মসমর্পণ করা হবে না', 'আমাদের এক ইঞ্চি জমি বা দুর্গগুলির একটি ইটও শত্রুকে ছাড়া হবে না।'

১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি অবরুদ্ধ প্যারি

শিল্পীর তুলিতে কমিউন রক্ষার লড়াই

আত্মসমর্পণ করল। এঙ্গেলস বলেছেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ এমন মর্যাদায় যা যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দুর্গগুলি সমর্পণ করা হল, নগরীর প্রাচীর থেকে কামানগুলি সরিয়ে ফেলা হল, সরকারি সেনাবাহিনীর অস্ত্র তুলে দেওয়া হল বিজয়ী বাহিনীর হাতে আর তারা গণ্য হল যুদ্ধবন্দি হিসাবে। কিন্তু প্যারির প্রলেতারিয়েতদের নিয়ে গঠিত জাতীয় রক্ষিবাহিনী তাদের অস্ত্র আর কামান হাতছাড়া করেনি।

সন্ধির শর্ত অনুসারেই ৮ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স জুড়ে জাতীয় সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্যারি এবং কয়েকটি শহর ছাড়া রক্ষণশীলরা, রাজতন্ত্রীরা নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পেল। গ্রামের ভোটাররা, কৃষকরা এই যুদ্ধ আর চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি। তারা চেয়েছিল যে-কোনও মূল্যে শান্তি। নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটল। এই রায় যুদ্ধ বিরতির পক্ষে রায়, প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, 'লাল'দের মাথাচাড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে রায়। প্যারি তার মর্যাদা রক্ষা করল। প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করল ৪৮-এর নায়কদের— লুই ব্লাঁ, গারিবল্ডি, ভিক্টর হুগো, গামবেতা, দেলসক্লুজ, পিয়ে, রোশোফোর। নির্বাচিত হতে পারলেন না শুধু ব্লাঙ্কি।

বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন তিয়ের। রাজতন্ত্রীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিয়েরই নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানরূপে নির্বাচিত হলেন। এই তিয়ের সম্পর্কে মার্ক্স বলেছিলেন, ফরাসি বুর্জোয়াদের শ্রেণিকলুষের চরম বুদ্ধিগত প্রকাশ। সর্বদাই পুঁজির কাছে শ্রমের দাসত্ব— এই হল তিয়েরের নীতির মূল কথা।

তিয়েরের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা কাজ শুরু করল— প্যারিসে নয়— বোর্দোতে। প্যারিসকে তারা বিশ্বাস করে না। তাদের প্রথম কাজ হল প্যারিসকে শিক্ষা দেওয়া।

আইনসভার প্রথম অধিবেশনে গ্যারিবল্ডিকে ভাষণ দিতে দেওয়া হল না। তিনি বিদেশি এই অজুহাতে। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী এই নেতা এসেছিলেন ফরাসিদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করতে। ভিক্টর হুগো বক্তৃতা দিতে উঠলে তাঁকে অপমান করা হল। হুগো পদত্যাগ করলেন। একে একে প্যারির ছজন বামপন্থী সদস্যই পদত্যাগ করলেন। শান্তিচুক্তি বিপুল ভোটে অনুমোদিত হয়ে গেল।

প্যারি শহরের মধ্য দিয়ে জার্মানদের বিজয় মিছিল করার শর্তটি যেন প্যারিবাসীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে দিল। কিন্তু বিজেতা জার্মান বাহিনীও মূল শহরে ঢোকার সাহস দেখাতে পারল না।

তিয়ের সরকার ১০ মার্চ সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় সভা বোর্দো থেকে প্যারিস আসবে না— ভার্সাইতে যাবে। প্যারিসকে রাজধানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে প্রতিশোধ নেওয়া হল।

১১ মার্চ সরকার কতগুলো আইন নিয়ে এল যা প্যারির পেটি বুর্জোয়াদের, নিম্নবিত্ত-কেরানি-দোকানি-কারিগরদের শ্রমিক শ্রেণির দিকে ঠেলে দিল। যুদ্ধ ও অবরোধের জন্য যে সব কর মুলতুবি রাখা হয়েছিল, তা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলল। সমস্ত জমে থাকা ভাড়া বাড়িওয়ালাদের এক্ষুনি শোধ করে দিতে বলল ভাড়াটিয়াদের। ন্যাশনাল গার্ডদের বেতন বন্ধ করে দিল।

জার্মানরা প্যারিসে থাকা ফরাসি কামানগুলো দখল করার আগেই ন্যাশনাল গার্ডরা দুশো কামান দখল করে নিয়েছিল। এইসব কামান জনগণের চাঁদায় কেনা, তাই জনগণের সম্পত্তি।

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই শ্রমিক মহল্লাগুলিতে 'কমিউন জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এখানে-ওখানে লাল পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছিল। ৩ মার্চ বাম মনোভাবাপন্ন ব্যাটেলিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠল ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। একদিকে তিয়ের সরকারের অনুগত এক ডিভিশন সেনা, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থাশীল সাড়ে তিন লাখ ন্যাশনাল গার্ড— ১৮৭১ এর মার্চের প্রথম দিকেই প্যারিসে গড়ে উঠল দুটি ক্ষমতাকেন্দ্র। তিয়ের সরকারের প্রতি বিরূপ প্যারিবাসী ক্রমশ কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থাশীল হয়ে উঠতে থাকল। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ঘটল প্যারি কমিউনের আবির্ভাব।

তিয়েরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, প্যারির নিয়ন্ত্রণ তার সরকারের হাত থেকে অতি দ্রুত সরে যাচ্ছে। একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জন্ম নিচ্ছে। তার চিন্তার কারণ প্যারিবাসীর হাতের অস্ত্র আর এই কামানগুলো। তিনি জেনারেল ভিনয়কে আদেশ দিলেন ন্যাশনাল গার্ডের থেকে কামানগুলো উদ্ধার করতে। তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পথে প্যারিই একমাত্র গুরুতর প্রতিবন্ধক। তাই প্রয়োজন হল প্যারিকে নিরস্ত্র করা। ভিনয়কে কামান কাড়ার নির্দেশ দিয়ে তিয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন।

১৮ মার্চ ভোরবেলা সেনাবাহিনী শহরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু প্রথম দিকে সাময়িক কিছু সাফল্য ছাড়া সেনারা ব্যর্থ হল। গোটা প্যারিবাসী এক হয়ে দাঁড়াল তাদের প্রতিরোধে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে মেহনতি জনতা ও ন্যাশনাল গার্ড একত্রে বিপুল বিক্রমে লড়াই চালাতে থাকে। সেনাদের দখল করা কামানগুলি ছিনিয়ে নেয় তারা। বিপুল জনতা সেনাদের ঘিরে ফেলে বোঝাতে থাকাল, তোমরা কেন এই জঘন্য কাজ করতে এসেছ? যারা তোমাদের পাঠিয়েছে তারা দেশকে জার্মানির কাছে বেচে দিয়েছে, তারা আবার দেশে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চায়। সহস্র মানুষের উতপ্ত আবেগের সম্মোহনী প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল গরিব ঘরের ছেলে এই সব সোনারা। মোঁমার্ত্র, বাস্তিল, বেলভিল প্রভৃতি নানা জায়গায় উপরওয়ালার হুকুম অমান্য করে সেনাবাহিনী জনতার সঙ্গে একত্রে স্লোগান দিতে থাকল— সেনাবাহিনী ও জনগণের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক, তিয়ের-ভিনয় নিপাত যাক। প্রায় সব কামানই জনগণের হাতে থেকে গেল, আরও পাওয়া গেল সেনাদের কাছ থেকে হাজার হাজার আধুনিক রাইফেল। তিয়ের চিন্তিত হয়ে পড়লেন— দ্রুত সৈন্যদের সরিয়ে না ফেললে বিদ্রোহীদের সংস্পর্শে তারা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। ফলে সরকারকে ভার্সাইয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। তিয়ের

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্যারি কমিউন

পাঁচের পাতার পর

সহ মন্ত্রীরা দ্রুত প্যারিস ছাড়লেন। তাদের সাথে প্যারিস ছাড়ল মধ্যবিত্তদের একটা অংশ। এর ফলে ন্যাশনাল গার্ডে শ্রমিকদেরই সংখ্যাধিক্য ঘটল।

অতি দ্রুত বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিতে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। মার্কসের ভাষায় "মেহনতি মানুষের মহান বিপ্লব ১৮ মার্চ প্যারিসে পূর্ণ কর্তৃত্ব দখল করে।"

এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহান সংগ্রামে পরবর্তীকালে কমিউন রক্ষার লড়াইয়ে মহিলারা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন।

এই সংগ্রামে দিমিত্রিয়েভা ও লুই মিশেল নামে দুই শিক্ষিকার নেতৃত্বে একটি সংগ্রামী মহিলা রক্ষী বাহিনী সংগঠিত হয়। এই রক্ষী বাহিনী প্রধানত প্রতিরক্ষা কার্যে নিয়োজিত হবে বলে ঠিক হলেও, আক্রমণাত্মক যুদ্ধেও এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কমিউন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছেন এমন একজন বুর্জোয়া সাংবাদিক কোনও একটি ইংরেজি দৈনিকে সে সময়ে লিখেছিলেন, "যদি ফরাসি জাতি শুধু নারীদের নিয়ে তৈরি হয়, তবে সে কী প্রচণ্ড শক্তিশালী হবে!"

পরিস্থিতির যে এত দ্রুত এবং এমন পরিবর্তন ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বামপন্থী নেতারাও নয়। তাঁরা ভাবতেও পারেননি এমন করে হঠাৎ ক্ষমতা হাতে চলে আসবে। প্যারির দক্ষিণ ফটক দিয়ে ভিনয় সসৈন্যে মার্চ করে বেরিয়ে গেল। আটকানোর কথা কারও মনেও হল না। কেন্দ্রীয় কমিটি পলাতক সরকারের দপ্তরগুলি একের পর এক দখলে নিয়ে নিল। ওতেল দ্য ভিল এখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। ১৭৯৩ এর পর এই প্রথম বিপ্লবীরা প্যারির একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হল।

মার্ক্স বললেন, সম্রাটতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কমিউন। কমিউন সামাজিক মুক্তির রাজনৈতিক রূপ। শ্রমিকদেরই তৈরি। শ্রমের উপায়ের উপরে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দখলদারির থেকে শ্রমের মুক্তির ধরন।

কেন্দ্রীয় কমিটির উপর ন্যস্ত হল এক বিরাট দায়িত্ব। কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুই একজন আন্তর্জাতিকের সদস্য ছাড়া বাকিদের কারওরই তেমন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তা সত্ত্বেও কমিটির চেয়ারম্যান ক্রিসেট ও ধর্মঘটের নেতা অ্যাসির তত্ত্বাবধানে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তা মেহনতি মানুষের সরকার। আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউন তখনও ঘোষিত না হলেও তখন থেকেই কমিউনের রাজত্বের শুরু বলা যায়। ১৯ মার্চ শুরু হল এক নবযুগ। প্যারি-অভ্যুত্থানের খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউন প্রতিষ্ঠার আগেই লিয়ঁ, নারবুগে প্রভৃতি শহরে কমিউনের প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ২১ মার্চ এক ঘোষণায় বন্ধকী দোকানের জিনিসপত্রের নিলাম করা নিষিদ্ধ করা হল। অভাবের তাড়নায় শ্রমিক পরিবারের নিত্যব্যবহার্য জিনিসও বাঁধা পড়ত। মহাজনের দেনা শোধ করার জন্য খাতকদের আরও সময় মঞ্জুর করা হল। বাড়িওয়ালারা আর ভাড়া বাকির জন্য ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। এই ঘোষণাগুলি শ্রমিক ও গরিব জনতাকে কমিউনের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল। কমিউনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বিদেশিদের নির্বাচন বৈধ ঘোষণা করা হল। কমিটি এক আদেশে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করে দিল। তিয়ের সরকারের সাথে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সব ভার্সাই পালিয়ে গেছে। সরকারের কাজে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় অতি দ্রুত সব বিভাগের কাজ চালু করতে সক্ষম হল। প্যারির জীবন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল।

সরকার চালাতে কমিউনের নেতারা ধনকুবের রথচাইল্ডের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স থেকে দশ লক্ষ ফ্রাঁ ধার নিলেন। ব্যাঙ্ক কেন দখল করা হল না, এই প্রশ্নটি পরবর্তী সময়ে মার্ক্স লেনিন উভয়েই তুলেছেন। তাঁদের মতে ব্যাঙ্ক যদি কেন্দ্রীয় কমিটির দখলে আসত তা হলে ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণির নাভিশ্বাস উঠত— তারা তিয়েরকে প্যারির শাসকদের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করত।

বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনের মারফত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

এত শীঘ্র নির্বাচন মারফত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

২৬ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিপ্লবী, মডারেট, সোস্যালিস্ট, অ্যানার্কিস্ট সকলেই নির্বাচিত। নির্বাচিতদের মধ্যে রয়েছেন সব পেশার মানুষ— শ্রমিক, কেরানি, ছোট ব্যবসাদার, সাংবাদিক, লেখক, চিত্রকর। দু-দফায় নির্বাচনের পরে নির্বাচিত ৯২ জন সদস্যের ভিতরে ১৭ জন ছিলেন প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্য। ২১ জন ছিলেন শ্রমিক, ৩০ জন ছিলেন লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং ১৩ জন ছিলেন কেরানি। বিখ্যাত শিল্পী কুরবে অন্যতম সদস্য ছিলেন। ব্লাঙ্কি নির্বাচিত হলেও জেলে থাকায় সক্রিয় অংশগ্রহণে সক্ষম হননি। ছিলেন পঁটিয়ে, পরবর্তীকালে যিনি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। আর ছিলেন লঁগে (কার্ল মার্কসের জামাতা)।

৯২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকে— যুদ্ধ, অর্থ, খাদ্য সরবরাহ, পররাষ্ট্র, শ্রম, বিচার, স্বাস্থ্য, জনসংযোগ ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ন'জনকে নিয়ে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এই পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ব্লাঙ্কি আর প্রুধোঁর অনুগামী।

২৮ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে হোটেল 'দিন ভিই'-তে কমিউন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হল। সমগ্র শহরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হল ইতিহাসের পাতায় এক নতুন রাষ্ট্র। সর্বপ্রথম শ্রমিক-মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি হল।

জন্মমুহূর্ত থেকে কমিউন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে রত। তারই সঙ্গে প্রবল উৎসাহে দুনিয়াকে বদলানোর জন্য কমিউন দৃঢ়সঙ্কল্প। ২৮ মার্চ চার্লস বেলের সভাপতিত্বে কমিউনের প্রথম অধিবেশন বসে। তারপর থেকেই একের পর এক আইন পাস হতে থাকে। এই সব আইন, অর্ডিন্যান্স, ঘোষণা যা কমিউনের শ্রমিক চরিত্রকে স্পষ্ট করেছিল, যা প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা— সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যা শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রের এক রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল।

স্বল্পকালের মধ্যেও যে সব উল্লেখযোগ্য কাজ কমিটি সম্পন্ন করতে পেরেছিল, তার মধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে দু'টি কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বতন রাষ্ট্রের ভাড়াটে সৈন্যকে পুরোপুরি বরবাদ করে দিয়েছিল কমিউন। তার জায়গায় তৈরি করেছিল জাতীয় রক্ষী বাহিনী, যেটা তখন সে যুগের মতো করে গণফৌজের রূপ নিয়েছিল। যে কোনও নাগরিক অস্ত্র ধারণে সক্ষম হলেই তাকে রক্ষীবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়। ভাড়াটে সৈন্যের উপরে নির্ভর না করে জনগণকে সশস্ত্র করে তুলে তার উপরে রাষ্ট্রের রক্ষাকার্য ন্যস্ত করা নিঃসন্দেহে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে ফেলে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

কমিউন গঠিত হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় কমিটি তার অফিসিয়াল জার্নাল মারফত ঘোষণা করেছিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বেশিরভাগটা দিতে হবে যুদ্ধ যারা বাধিয়েছিল তাদেরই। কমিউনের উপর বুর্জোয়াদের রাগ হবে না-ই বা কেন!

দেখা যাক অন্যান্য সব ঘোষণার রূপ কী ছিল ঃ

১) সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা ৬ হাজার ফ্রাঁ-তে বেঁধে দেওয়া হল, যা একজন দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের মোটামুটি সমান। সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণও কমিউন আগের থেকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। একই ব্যক্তি একাধিক দায়িত্বে থাকলেও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা নাকচ করা হয়। এই দেখে বিস্মিত বিজ্ঞানী অধ্যাপক হাক্সলি বললেন, ব্রিটেনের মেট্রোপলিটন স্কুল বোর্ডের একজন কেরানিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যতটা দরকার এই বেতন তার এক পঞ্চমাংশের থেকে কিছুটা বেশি।

২) শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা এবং রুটির কারখানার রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ হয়। শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্তকে বিপুল সমর্থন জানায়। আট ঘণ্টা শ্রম-দিবস ঘোষণা করা হয়। যদিও রাষ্ট্র পরিচালিত কারখানা এবং প্রশাসনের বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীরা কমিউনের স্বার্থে বিনা মজুরিতে আরও দু-ঘণ্টা বেশি কাজ করতে থাকেন।

শ্রম-দপ্তরের উদ্যোগে সিন্ডিকেট চেম্বার্স গঠন করা হয়— যার কাজ পরিত্যক্ত কারখানাগুলির দখল নিয়ে শ্রমিক-সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা। যেসব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিকের অনুগামী লিও ফ্রাঙ্কেলের নেতৃত্বে খোদ শ্রমিকদের নিয়ে শ্রম-কমিশন গঠিত হয়। প্রতি মহল্লায় কর্মসংস্থান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বেকার শ্রমিকদের সাহায্য দান কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য হয়।

৩) কৃষি আর কৃষকের সমস্যা নিয়েও কমিউন ছিল সজাগ। কৃষি দপ্তরের ভার ছিল লিও ফ্রাঙ্কেলের বন্ধু জার্মান শ্রমিক ভিক্টর শিলির উপর।

৪) প্যারি রক্ষার সংগ্রামে নিহতেদের বিধবা আর সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয় কমিউন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোক বা না হোক, সমস্ত নিহতের স্ত্রীদের বার্ষিক ছশো ফ্রাঁ পেন্সন ঘোষণা করা হয়। পতিতাবৃত্তি বন্ধের চেষ্টাও কমিউন আন্তরিক ভাবে চালায়।

৫) ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা করা হয়, ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। কমিউন নেতাদের মতে, যাবতীয় দুঃখ আর দুর্নীতির মূলে রয়েছে চার্চ। রাষ্ট্রকে চার্চের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয়। কতকগুলি চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জনগণের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে চার্চের জন্য অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করা হয়।

৬) নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভার নেন আন্তর্জাতিকের অনুগামী, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ভেলাঁ। শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়। স্কুলে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার, নীতিবাক্য উচ্চারণ ও প্রার্থনাসঙ্গীত বন্ধ করে দেয় কমিউন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল যাজক শিক্ষক ছিলেন তাদের বরখাস্ত করা হয়। কমিউন স্ত্রী-শিক্ষার উপর জোর দেয়। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত নারীদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে কমিউন বিশেষ কমিশন গঠন করে। কারখানা লাগোয়া নার্সারি খোলা হয়, যাতে কর্মরত মহিলারা সেখানে শিশুসন্তানদের পরিচর্যার জন্য রেখে যেতে পারেন।

গঠিত হয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি। এতদিন মুষ্টিমেয় ধনীরাই কলারসিক বলে পরিচিত ছিল। কমিউন মনে করে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেই নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী। লুভর মিউজিয়মের আর্ট গ্যালারি সকলের জন্য খুলে দেওয়া হল।

কুর্বে এবং পতিয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় শিল্পীসংঘ। লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর, নট, নাট্যকার শিল্পের সব শাখার গুণী ব্যক্তিরা রয়েছেন তাতে। শিল্পীসংঘ ঘোষণা করল, শিল্পীও একজন শ্রমিক। শ্রমজীবী মানুষ হিসাবে শিল্পী তার কাজের জন্য নিশ্চয় উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে, কিন্তু কোনও মতেই শিল্পী নিজেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ বলে মনে করবে না।

সমস্ত বিচারক তথা প্রশাসকদের পদকে নির্বাচনভিত্তিক করা হয়। অদক্ষ বা অযোগ্য প্রমাণ হলে নির্বাচকদের তাদের প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায় জনগণের ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে তোলা হয়।

স্বল্পকালস্থায়ী কমিউনের এমন সংস্কারগুলির তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। রাষ্ট্রযন্ত্রে কমিউন-প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে সর্বহারা একনায়কত্বের দিকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। অবশ্য শত্রুবেষ্টিত নগরীতে এই সব সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার ব্যাপারটা শুরু করা মাত্র সম্ভব ছিল। মে মাসের গোড়া থেকেই ভার্সাই সরকার ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে থাকে। তার বিরুদ্ধে লড়াইতেই কমিউনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হতে থাকে। (ক্রমশ)

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত সংক্রামক রোগ রুখে দিতে পেরেছিল

কোভিড অতিমারির বিপর্যয় ও বিপন্নতা প্রতিদিন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত দেশের সংক্রমিতের সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। মারা গেছেন চার লাখেরও বেশি মানুষ। অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ যেতে না যেতেই তৃতীয় ঢেউ আসার কথা শোনা যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা, সরকারি হাসপাতালের অভাব, হাসপাতালে বেডের অভাব, অক্সিজেন ও ওষুধ নিয়ে কালোবাজারি, নাগরিকদের টিকা না পাওয়া, টিকা নিয়ে কালোবাজারি প্রভৃতি বিষয়গুলি দেশের মানুষকে চূড়ান্ত অসহায়তার সামনে দাঁড় করিয়েছে। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থে নীতি নির্ধারণের বদলে সরকার যে একমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থেই যাবতীয় নীতি প্রণয়নে বদ্ধপরিকর, তা একটু সচেতন থাকলেই নজরে এসেছে। স্বাস্থ্য-পরিষেবা নাগরিকদের মৌলিক ও সর্বজনীন অধিকার হিসাবে সংবিধানে থাকলেও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কোনও সরকারই যে তা রূপায়িত করার উদ্যোগ নেয়নি। বিপরীতে, এই ক্ষেত্রটিকে মুনাফার স্বার্থে ক্রমাগত আরও বেশি করে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট-বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগত কমানো হচ্ছে এবং সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভগ্নস্তূপে পরিণত হচ্ছে।

অথচ বেশি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা দেশের সিংহভাগ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটগ্রস্ত কোটি কোটি মানুষ তাই একটু চিকিৎসার সুযোগ পেতে হন্যে হয়ে পড়ছেন।

ঠিক বিপরীত চিত্রের সাক্ষী থেকেছে পৃথিবী

ঠিক এর বিপরীত চিত্র আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্মূল করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটেছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের। সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের জীবনের মূল্য ছিল সর্বাধিক। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে গর্ভাবস্থা থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্যপরিষেবা ছিল যথার্থই সর্বজনীন অধিকার। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে মর্যাদাময় সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সোভিয়েত সরকার ছিল বদ্ধপরিকর।

বিপ্লবের আগে রাশিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছিল জঘন্য। যতটুকু স্বাস্থ্যপরিষেবা মিলত, তার পুরোটাই ভোগ করত জার ও অভিজাতরা। অভিজাতদের জন্য হাসপাতাল, স্যানিটোরিয়াম, অ্যাসাইলাম সবই ছিল। গরিব মানুষ এর খরচ চালাতে পারত না। তাদের নির্ভর করতে হত অদক্ষ গ্রামীণ চিকিৎসক, যাজকদের ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, ধর্মীয় আচার-কুসংস্কার প্রভৃতির ওপর। রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চোখের জল ফেলা বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় ছিল না। স্মলপক্স, সাইফাস, যক্ষ্মা ও সূতিকা রোগে হাজার হাজার মানুষ অসহায় ভাবে প্রাণ হারাত।

এই রাশিয়ার বুকেই ১৯১৭ সালে মহান লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়। সমস্ত প্রতিকূলতা হঠিয়ে উন্মোচিত হয় মানবমুক্তির নতুন দিগন্ত। সমাজতন্ত্র সকলের কর্মসংস্থান সহ বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।

সমাজতন্ত্র সকল নাগরিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রের মালিকানা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের হাতে। সমাজ গঠনের দায়িত্ব নেবে যে মানুষ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল, তাকে দেহ-মনে সুগঠিত করে গড়ে তোলা। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে একদিকে যেমন যেমন শরীর গঠন ও সুস্থতার জন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তেমনই দেশের প্রতিটি মানুষকে মদের নেশা থেকে মুক্ত করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সেখানে ছিল রাষ্ট্র পরিচালিত সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। এর খরচ শ্রমিকের মাইনে থেকে কাটা হত না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিগত মুনাফার কোনও জায়গা থাকে না, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকরা যা উৎপাদন করত তার একটা অংশ জমা পড়ত এই সামাজিক সুরক্ষা খাতে। আমাদের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে লাইফ ইন্সিওরেন্স, হেলথ ইনসিওরেন্স, হেলথ এন্টাইটেলমেন্ট কার্ড, থার্ড পার্টি ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রকল্পগুলির সাথে যখন কোনও না কোনও ভাবে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে যুক্ত থাকতে দেখা যায় এবং ইন্সিওরেন্স ব্যবসা পরিচালিত হয় ব্যক্তির মুনাফার উদ্দেশ্যে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রই দেশের সকল শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা তাদের ব্যক্তিগত খরচ ছাড়াই নিশ্চিত করেছিল। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সকলের সুচিকিৎসার জন্য স্তরে স্তরে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রচুর সংখ্যায় অ্যামবুলেটোরিয়াম, পলিক্লিনিক, সাধারণ হাসপাতাল, সোস্যাল হাসপাতাল, মেটারনিটি হাসপাতাল, টিবি এবং সাধারণ রোগের ক্লিনিক, টিবি স্যানেটোরিয়াম, নাইট স্যানেটোরিয়াম, বিশ্রামাবাস আর অসংখ্য মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক লেনদেন না থাকায় চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে ছিল সহজ সম্পর্ক। প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে সরকার স্বাস্থ্য খাতে বিপুল বরাদ্দ করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বাগ্রে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিল রোগ-প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে। কারণ প্রতিরোধ উন্নত হলে মানুষ অসুস্থ হবে কম, এটাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল কথা। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ঢালাও প্রচার করা হলেও তা আসলে একটা পরিহাস। কারণ মানুষ অসুস্থ না হলে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুনাফার সুযোগ নেই। রাশিয়া কিন্তু প্রতিরোধমূলক ও সামাজিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োগে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিল। ওই সময়ে রাশিয়া সহ ইউরোপের দেশগুলোতে মহামারীর রূপ নিত টাইফাস রোগ। মারা যেত লক্ষ লক্ষ মানুষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল ভূখণ্ডে আবহাওয়ার তারতম্য, বিভিন্ন জনজাতি ও জীবনযাত্রার মানুষের অবস্থান, প্রভৃতি নানা কারণে ইউরোপীয় অন্য দেশগুলোর তুলনায় বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার ছিল এখানে বেশি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর ১৯১৮ সালে সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তখন রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শিশু সমাজতন্ত্রের গলা টিপে মারতে মরিয়া। সেই কঠিন সময়েও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে একটি ডিক্রি জারি করা হয়। ১৯১৮ সালেই লেনিন স্মলপক্সের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করলেন। ১৯৩০ সালে ডিপথেরিয়ার বিরুদ্ধে টিকাকরণ বাধ্যতামূলক হয়। ১৯২৯ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, যখন ইংল্যান্ডের মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ১০,৯৬৭ জন স্মলপক্সে মারা গেছেন তখন এর দশগুণ জনবহুল রাশিয়াতে মারা গেছেন মাত্র ৬০৭৯ জন।

প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও রোগ মোকাবিলায় জোর দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন

যুদ্ধপরবর্তী রাশিয়ায় অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত ছিল দেশ। চলছিল অর্ধাহার। রুটির রেশন ছিল সীমিত। রেশনে মাংস মিলত না। চিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বিলাস সামগ্রী। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অপুষ্টির দরুন মহামারী ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৯২০ সালে টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ। কিন্তু প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও রোগ সংক্রমণ মোকাবিলায় সোভিয়েত সরকার বিশেষ যত্ন নিয়েছিল। কোনও শ্রমিক অসুস্থ হলে সংক্রমণ ছড়ানো আটকাতে তাকে পরিবার থেকে সরিয়ে বিশ্রামাগারে রেখে চিকিৎসা করা হত। থাকত তাদের বিশ্রাম ও আহারের বন্দোবস্ত। আবার ওই সময়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছিল সোভিয়েত সরকার। যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক ভগ্নদশা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি অতিক্রম করা এবং যথাসম্ভব দ্রুত পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমগ্র পর্বটির প্রয়োজনের উপযোগী করে 'নয়া আর্থিক' কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। পাশাপাশি ১৯২১ সালের নিদারুণ খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সোভিয়েত সরকারকে ব্যাপক উদ্যোগী হতে হয়েছিল। এত বিপদের মধ্যেও প্রত্যেক অসুস্থ নাগরিকের চিকিৎসা পাওয়া ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কাজটি সোভিয়েত সরকার পুরোদমে চালিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ফলে সেই সম্পদ সুরক্ষিত রাখা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে মনে করত এবং সেইমতো নীতি নির্ধারণ করত, যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কল্পনার অতীত।

যে কোনও সংক্রমণ রুখে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া

ভারতের মতো একটি দেশ, যেটি বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে, সেখানেও দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে সরকার। ২০২০-'২১-এ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ১.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতে, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন (ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ.ডাউনটুআর্থ.ওআরজি, ১ ফেব্রুয়ারি, '২১)। ঠিক এর বিপরীত চিত্র দেখা গিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায়। সেখানে বিপুল পরিমাণ অর্থ— কেন্দ্রীয় বাজেটের ১৭ শতাংশ সার্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবা খাতে ব্যয় করা হত। সোভিয়েত সংবিধানের ৪২ নং ধারা প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করেছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে মহান স্ট্যালিনের তত্ত্বাবধানে দেশে ডাক্তারের সংখ্যা ৬৩ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছিল ৭৬ হাজার। হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ২ লাখ ৫৭ হাজার থেকে বেড়ে হয় ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার। পৃথিবীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নেই ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যে কোনও সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেওয়া

আটের পাতায় দেখুন

ভর্তি ফি সম্পূর্ণ মকুব ও দ্রুত স্কুল খোলার দাবিতে তমলুকে ডিআই অফিস ঘেরাও

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সম্পূর্ণ ভর্তি ফি মকুব, মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের টাকা ফেরত, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবিলম্বে স্কুল খোলা ও ইয়াস বিধ্বস্ত ছাত্রছাত্রীদের সরকারি উদ্যোগে পাঠ্যসামগ্রী প্রদানের দাবিতে ১৪ জুলাই তমলুকে জেলা স্কুল পরিদর্শককে ঘেরাও করল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। শতাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, এই লকডাউনের সময়েও বিগত বছরগুলির মতো স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কাছ থেকে ইলেকট্রিক ফি, গেম ফি, ম্যাগাজিন ফি, লাইব্রেরি ফি, ল্যাবরেটরি ফি সহ নানা ফি নিচ্ছে যেগুলি ছাত্ররা ব্যবহারই করতে পারেনি।

জেলা সভাপতি স্বপন জানা বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবিলম্বে স্কুল খোলার বিষয়ে সরকারকে তৎপর হতে হবে। বেলা একটা থেকে চারটে পর্যন্ত অবরোধের পর ডিআই প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিনিধিদের জানান, ইতিমধ্যে বাড়তি ফি না নেওয়ার নির্দেশিকা তিনি জারি করেছেন এবং কোনও ছাত্র যদি ফি দিতে অপারগ হয়, তাকে ফি দিতে বাধ্য করা যাবে না এই নির্দেশিকাও জারি করেছেন। তিনি অন্যান্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড রবীন চক্রবর্তী ১ জুন করোনা আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

কমরেড রবীন চক্রবর্তীর ভাই দলের সর্বক্ষণের কর্মী। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি দলের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কাজ করতে শুরু করেন। এলাকায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে গরিব মানুষের সাথে তাঁর অত্যন্ত নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অত্যন্ত মিশুকে, রসিক এবং প্রতিবাদী মানুষ হিসাবে তিনি এলাকায় পরিচিত ছিলেন। মানুষের আপদে-বিপদে সবসময় ছুটে যেতেন। তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি ছোট-বড় সকলের সাথে খুব সহজভাবে মিশতে পারতেন। অত্যন্ত অভাবের সংসার হলেও তাঁর মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকত।

তাঁর অকাল প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ১১ জুলাই অনলাইনে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তা ছিলেন দলের হাবড়া লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড তুষার ঘোষ এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। অন্যান্য কমরেডরাও তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে দল একজন জনপ্রিয় সহযোদ্ধাকে হারাল।

কমরেড রবীন চক্রবর্তী লাল সেলাম

গভীর শ্রদ্ধায় দেশ জুড়ে স্মরণ করা হল হুল বিদ্রোহের শহিদদের

১৮৫৫ সালের ৩০ জুন বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার ভগ্নাডি গ্রামে হাজার হাজার শোষিত নির্যাতিত প্রতিবাদী মানুষের সমাবেশের মধ্য দিয়ে হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ সূচনা হয়েছিল। জমিদার, মহাজন ও পুলিশ প্রশাসনের শোষণ-অত্যাচারের প্রতিবাদে সমবেত এই জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিদো মুর্মু ও কানহু মুর্মু। পুলিশ সিদো-কানহুকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে সশস্ত্র আন্দোলন বা হুল শুরু হয়। একদিকে তির-ধনুক সহ প্রাচীন অস্ত্র নিয়ে নিপীড়িত মানুষ, অন্যদিকে বন্দুক-কামানের মতো আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ— এই অসম লড়াইয়ে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ আত্মাহুতি দেন। ইতিহাসে এটি সাঁওতাল বিদ্রোহ হিসাবে উল্লেখিত হলেও এতে কামার, কুমোর, জোলা, তাঁতি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু ও গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লড়াইয়ের শহিদদের স্মরণে ৩০ জুন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বানে গভীর শ্রদ্ধায় দেশ জুড়ে পালিত হয় হুল বার্ষিকী। সিদো-কানহুর মূর্তি, শহিদ বেদি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে হুল দিবস পালিত হয়। কলকাতার সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ও জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক বিসম্বর মুড়া। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক পরিমল হাঁসদা সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা।

১-৭ জুলাই বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৬৬তম হুল বার্ষিকী পালিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়— ১) আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের জঙ্গল-জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬-এর উপর সুপ্রিম কোর্টের যে রায়ের ফলে এগারো লক্ষের মতো মানুষ রুটি রুজি ও আশ্রয় হারানোর সম্মুখীন হয়েছেন, সেই রায়ের পুনর্বিবেচনা করতে হবে। জঙ্গলের অধিকার পুরোপুরি কার্যকর করে আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে, ২) বর্তমান করোনা অতিমারিতে বিনামূল্যে করোনা প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিকে চালু রাখার যথাযথ উদ্যোগ ও দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। সমস্ত হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিও যাতে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়ে বেকার হওয়া ও গরিব মানুষদের রুটি রুজির জন্য কৃষিকাজে সরকারকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। যে ভেস্টেড জমি বা জঙ্গলের জমিতে গরিব মানুষ চাষ আবাদ করেন সেই জমি কেড়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া সরকার বন দপ্তরকে দিয়ে শুরু করিয়েছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, ৩) ইয়াস বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রেশন দিতে হবে। জমিকে কৃষি উপযোগী করার জন্য চাষিদের সরকারি সাহায্য দিতে হবে। ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামত ও কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করতে হবে, ৪) রাজ্যে রাজ্যে আদিবাসীদের জমি রক্ষার আইনগুলি সংশোধন করা যাবে না, ৫) কোনও অজুহাতেই অরণ্যের অধিকার কর্পোরেট ও পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।

সোভিয়েত পেরেছিল

সাতের পাতার পর

হত। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া একেবারে শুরুতেই বলশেভিক ডাক্তারদের নেতৃত্বে মেডিকেল ও স্যানিটারি বিভাগ গড়ে তুলেছিল। গড়ে উঠেছিল স্বাস্থ্য ও মহামারী সংক্রান্ত বিভাগ। যে কোনও মহামারী রোখার কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিষেধক তৈরি ও প্রয়োগ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থা ছিল এই বিভাগটি। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে মহামারী বিরোধী কেন্দ্রীয় কমিশন, ভ্যাকসিন কমিশন, স্প্যানিশ ফ্লু রোগ ও টাইফাস জ্বর বিরোধী কমিশনগুলি গড়ে উঠেছিল। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত বলশেভিক পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক সরকার সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ১৮টি ডিক্রি জারি করেছিল। দেশ জুড়ে সকলকে ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যে সর্বস্তরে স্যানিটারি সেবা সদন গড়ে তোলা হয়েছিল যেগুলি সাধারণ রোগের চিকিৎসা ছাড়াও প্লেগ, কলেরা, স্মলপক্স, অ্যানথ্রাক্স ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই উদ্যোগের ফল দ্রুত পরিলক্ষিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯৩০ সালের মধ্যেই সেখানে কলেরা, ডিপথেরিয়া বা ম্যালেরিয়ার মতো মারণ রোগ প্রায় নির্মূল হতে শুরু করেছিল। স্মলপক্স ও টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাব রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। নাগরিকদের প্রাণ ও সুস্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা, মুনাফাচিন্তা বিহীন চিকিৎসা পরিষেবা,স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার যে সমস্ত সংক্রমণকে রুখে দিতে পারে, তা প্রমাণ করে দিয়েছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন।

মহামারী প্রতিরোধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অসাধারণ ভূমিকার দিকে চোখ রাখলে আজকের অতিমারিবিধ্বস্ত ভারত সহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের ব্যাপক বৈপরীত্য ভীষণ ভাবে চোখে পড়ে। মুনাফাসর্বস্বতা এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে জনস্বাস্থ্যকে পণ্যে পরিণত করেছে। যার ফল আজ জীবন দিয়ে ভুগতে হচ্ছে কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে। অথচ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ থেকে ১০০ বছর আগেই দেশের মানুষকে মহামারীর অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এই কাজ সম্ভব হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রয়েছে মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। সঠিক বিজ্ঞানসম্মত সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে রক্ষা করেছিল সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ নাগরিকদের জীবন। করোনা অতিমারির এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিশ্বজোড়া চূড়ান্ত সংকটের আবর্তে তাই সোভিয়েত স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে জানা ও উপলব্ধি করা আজ নিতান্ত প্রয়োজন।

(তথ্যসূত্র ঃ প্রোলেটারিয়ান এরা, ৫৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা, সোভিয়েত সমাজের ইতিহাস— প্রগতি প্রকাশন, মস্কো এবং সমাজতন্ত্রে জনস্বাস্থ্য— মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার)

দার্জিলিং-এ সিএমওএইচ ডেপুটেশন আশাকর্মীদের

১৬ জুলাই দার্জিলিং জিটিএ-র অন্তর্গত ৫টি ব্লকের ৫ শতাধিক আশাকর্মী দার্জিলিং স্টেশন থেকে মিছিল করে সিএমওএইচ দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশ তাঁদের ঢুকতে বাধা দেয়। আশাকর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। শেষে পুলিশ বাধ্য হয় গেট খুলে দিতে। ১০ মিনিটের মধ্যেদেখা না করলে শহর অবরুদ্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন আশাকর্মীরা। সিএমওএইচ দেখা করতে বাধ্য হন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মডিউলের ট্রেনিং আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শুরু করা হবে, কোভিডের বকেয়া টাকা দ্রুত দেওয়া হবে, কোভিড আক্রান্ত সকলকে ইনসিওরেন্স দেওয়া হবে, এরিয়ারের টাকা যাতে পাওয়া যায় সেটা দেখা হবে— এই চারটি দাবি তিনি মেনে নেন।

রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুনের নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধি দল সিএমওএইচ-এর সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সুখিয়া ব্লক থেকে ওম রাই, মিরিক ব্লক থেকে দিলু গুরুং, আর আর ব্লক থেকে নিশা তামাং, বিজনবাড়ি ব্লক থেকে রিনা ছেত্রী বিন্ডিকা প্রধান ও কার্শিয়াং-এর প্রতিনিধি এবং জেলা ইনচার্জ নমিতা চক্রবর্তী। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন এবং এআইইউটিইউসি-র জেলা ইনচার্জ জয় লোধ।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যাদবপুরে মহিলা বিক্ষোভ

পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে, করোনা মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সকলকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন, মিথ্যা মামলায় আটক, রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্তে মুক্তি প্রভৃতি দাবিতে ১৩ জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে এআইএমএসএস-এর বিক্ষোভ মিছিল।

স্বরূপনগর বিডিওতে শ্রমিক বিক্ষোভ

১৩ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর বিডিও অফিসে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। দাবি ছিল, ভ্যাকসিন, মাসিক ৭৫০০টাকা ভাতা, রেশনে ডাল-তেল-আলু, অভুক্তদের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কমিউনিটি কিচেন, লোকাল ট্রেন চালু। নেতৃত্বে ছিলেন সম্পাদক বেলা পাল, ছোট্টু মির্জা প্রমুখ। স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিডিও প্রদত্ত তালিকভুক্ত শ্রমিকদের দ্রুত ভ্যাকসিন দেওয়া ও অভুক্ত শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি কিচেনের দাবি মেনে নেন।

রবীন্দ্রনাথের বদলে যোগী আদিত্যনাথ!

প্রতিবাদ সেভ এডুকেশন কমিটির

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ১৬ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, উত্তরপ্রদেশে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পাঠ্যসূচিতে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, মুলক রাজ আনন্দ, আর কে নারায়ণ প্রভৃতি ব্যক্তিত্বদের রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও রামদেবের রচনাকে স্নাতক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সিবিএসই-র সিলেবাস কমানোর নামে আগেও বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশভাগ প্রভৃতি পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকার আরএসএস-এর পছন্দমতো শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এইভাবে চূড়ান্ত হিন্দুত্ববাদী চিন্তাকে গড়ে তোলার অপচেষ্টা করছে এবং তার মাধ্যমে হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার জমি তৈরি করছে। তিনি বলেন, আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে উত্তরপ্রদেশ বোর্ডকে এই ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত হওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে কিসান প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন

কেন্দ্রীয় সরকারের কালা তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ সংশোধনী বাতিল এবং সকল কৃষিপণ্য সহায়ক মুল্যে ক্রয়, জেলার সমস্ত অঞ্চলে ধান কেনার শিবির চালু, সমস্ত নিকাশি খাল সংস্কার সহ বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দাবিতে অল ইন্ডিয়া কিসান ও খেতমজদুর সংগঠনের নেতৃত্বে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১১টি ব্লক ও ১০টি অঞ্চলে কিসান

প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করা হয়। সর্বত্র অবস্থান, বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন দেন গ্রামের কৃষকরা। ময়না, পাঁশকুড়া (ছবি ১), শহিদ মাতঙ্গিনী, ভগবানপুর, উত্তর কাঁথি, এগরা প্রভৃতি ১১টি ব্লক ও ১০টি অঞ্চলে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রায় ৩০টি গ্রামে কমিটি গঠিত হয়েছে। এই সব কমিটির উদ্যোগে মিছিল পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ এবং জেলা নেতা, উৎপল প্রধান, বিবেক রায়, প্রবীর প্রধান প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ জানান, উপরোক্ত দাবিতে ২২ জুলাই জেলা সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্বে জেলাশাসকের দপ্তরে অবস্থান ধরনা অনুষ্ঠিত হবে।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির ত্রাণ বিতরণ

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলায় জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৫টি ব্লকের তালাকপ্রাপ্ত, নির্যাতিত ও পিছিয়ে পড়া মেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মাস্ক পরিধান ও করোনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয় এবং ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

যেকোনও প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা কিছু বুদ্ধিজীবীর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কবি জয় গোস্বামীর 'এই অসহ নিষ্ঠুরতা কেন' (৯ জুলাই) নিবন্ধে স্ট্যালিন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা—

দেশের ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনায়করা যে নির্মম নিষ্ঠুরতায় ৮৪ বছরের বৃদ্ধ অসুস্থ স্ট্যান স্বামীকে কারাগারের অন্তরালে তিলে তিলে হত্যা করেছে তা যে কোনও বিবেকবান মানুষকে যন্ত্রণাবিদ্ধ না করে পারে না। দেশের মানুষের এই যন্ত্রণার কথাই কবির কলমে বিধৃত হয়েছে। এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে হোঁচট খেলাম। দেখলাম কবি অনাবশ্যকভাবে স্ট্যালিন জমানার কথা তুলে রুশ কবি মান্দেলস্তামের প্রতি স্ট্যালিনের অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী পরিবেশন করেছেন এবং লিখেছেন, 'অবশেষে কবি ও শিল্পী মান্দেলস্তাম প্রবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন, এবং ওই বন্দি শিবিরেই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।' অন্য কথা বাদ দিলেও বলতে হবে, এখানে দুটো তথ্য ভ্রান্তি আছে। কবি মান্দেলস্তাম নিউমোনিয়ায় মারা যাননি, মারা গিয়েছিলেন টাইফয়েডে। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হয়ে কয়েক মাস পরে শ্রমশিবিরে। তাঁর জন্ম ১৪ জানুয়ারি, ১৮৯১ এবং মৃত্যু ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮। অর্থাৎ মান্দেলস্তাম, কবি জয় গোস্বামী কথিত ৩৯ বছর বয়সে মারা যাননি, মারা গিয়েছিলেন ৪৭ বছর বয়সে।

এরপর কবি জয় গোস্বামী, রাশিয়ার প্রবল শীতে মান্দেলস্তামকে গরম পোশাক সরবরাহ না করার কল্পকাহিনী বর্ণনা করে লিখেছেন, 'নিশ্চয়ই স্তালিনের এ রকমই নির্দেশ ছিল। এও নিশ্চয়ই গোপন সূত্রে পাঠানো নির্দেশ।' কোথা থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কবি জয় গোস্বামী তা আমাদের জানাননি। জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। যেভাবে তিনি জোরের সাথে 'নিশ্চয়ই' শব্দটি দু-বার ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হচ্ছে এটা তাঁর কল্পনা। একে আমরা কবি-কল্পনাও বলতে পারি। কিন্তু কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে স্ট্যালিনের মতো একজন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে যে অভিযোগ তোলা যায় না এ সত্য নিশ্চয়ই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এবার আসি কবি মান্দেলস্তাম সম্পর্কে স্ট্যালিনের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

এ কথা ঠিক, ১৯৩৪ সালে কবি মান্দেলস্তামকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই ঘটনায় সারা দেশ হতচকিত হয়ে পড়ে। দু-জন প্রথিতযশা কবি এর প্রতিকারে উদ্যোগী হয়েছিলেন— আন্না আখমোটাজ ও বরিস পাস্তেরনাক। পাস্তেরনাক বুখারিনের সাহায্য চাইলেন। বুখারিন পত্র দিলেন স্ট্যালিনকে।

সব শুনে স্ট্যালিন বললেন— 'কে কবি মান্দেলস্তামকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিল? কী লজ্জা!' মান্দেলস্তামকে তখনই ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

তারপর, স্ট্যালিন ফোন করলেন পাস্তেরনাককে।

স্ট্যালিন— মান্দেলস্তাম-এর বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিষয়টি আমাকে বা লেখকদের সংগঠনকে জানাননি কেন?— আমি যদি কবি হতাম এবং আমার বন্ধু বিপদে পড়ত, তবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য যতদূর যেতে হয় আমি যেতাম।

এই ঘটনা স্মরণ করে পরবর্তীতে মলোটভ বলেছিলেন— 'স্ট্যালিন বললেন, বন্ধুকে রক্ষা করার সাহস পাস্তেরনাকের নেই।'(স্ট্যালিন ঃ সেবাগ মন্টেফিওরে, র‍্যান্ডম হাউস, নিউইয়র্ক, ২০০০)।

একই ঘটনা স্মরণ করে, কবি পত্নী নাদেজাদা মান্দেলস্তাম লিখেছেন, স্ট্যালিন মান্দেলস্তাম সম্পর্কে পাস্তেরনাককে বলেছিলেন, হি ইজ এ জিনিয়াস, ইজ নট হি? (হোপ এগেইন্টস হোপ, পৃঃ ১৪৬)।

মুক্তির পর কবি মান্দেলস্তাম লিখেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ভরনেজ নোটবুক', 'অন দি আননোন সোলজার' ইত্যাদি। তিন বছরে অনুবাদ করেছিলেন উনিশটি গ্রন্থ। এই হল ইতিহাস। কবি মান্দেলস্তাম সম্পর্কে এই ছিল স্ট্যালিন ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ভূমিকা। সেই সময়, স্ট্যালিন শিল্পী সাহিত্যিকদের মানব মনের রূপকার বলে বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের কামান আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু আমাদের চাই নতুন ধরনের মানুষ এবং আপনারাই তার স্রষ্টা। তাঁর ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অকৃপণ সহায়তায় সেদিন সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-বিজ্ঞান, এক কথায় জ্ঞান জগতের সমস্ত ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছিল তা সশ্রদ্ধ চিত্তে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সবাই স্বীকার করেছিলেন। একে অস্বীকার করা যায়? এই অগ্রগতি বাদ দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়কে ব্যাখ্যা করব কীভাবে? স্ট্যালিন ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের এই ভূমিকার কথা আমরা ভুলে যাব? ভুলে যেতে পারি? সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যাঁরা স্ট্যালিন বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে তৃপ্ত হন, কবি জয় গোস্বামী তাঁদের দলে নাম লেখাবেন।

আন্দোলন তীব্র করতে বেকারি বিরোধী সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত

১৮ জুলাই অল ইণ্ডিয়া ডি ওয়াই ও এবং আন এমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটি (প্রস্তুতি)-র উদ্যোগে অনলাইনে বেকারি বিরোধী জাতীয় যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করেন অল ইণ্ডিয়া ডি ওয়াই ও সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড আলদালি রামানজানাপ্পা। ২৪টি প্রদেশ থেকে প্রায় ১৬ হাজার যুবক-যুবতী কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন উদ্বোধন করে পূর্বতন অ্যাডভোকেট জেনারেল আনন্দ মোহন মাথুর বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি অত্যন্ত অমানবিক আচরণ করছে। পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারিকরণ করে চাকরির নিশ্চয়তাকে কেড়ে নিচ্ছে। করোনা অতিমারিকে ঢাল করে একের পর এক জনবিরোধী নীতি প্রণয়ন করছে।

অনলাইন সভায় যোগ দিয়েছেন কর্ণাটকের যুবকর্মীরা

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেল, ব্যাঙ্ক, কৃষি সহ সকল সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বক্তারা বলেন, একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে নতুন করে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি কোটি কোটি যুবক-যুবতী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কোনও ভাবে চাকরি পাচ্ছেন না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাখ লাখ সরকারি বিভাগে শূন্যপদ পড়ে আছে। সেগুলো পূরণ করছে না। এমনকি যারা নিয়োগ পরীক্ষায় বসেছিলেন বছরের পর বছর তাদের নিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ না করে ঝুলিয়ে রেখেছে। অবিলম্বে এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার যুব আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করা হয়। কনভেনশন থেকে আগামী ৯ আগস্ট ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিবসে দাবি দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কনভেনশনে কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষক, ডেলিভারি বয়, ওলা-উবের-র‍্যাপিডো অপারেটার্স, শ্রমিক, যুবক-যুবতী প্রাইভেট টিউটর প্রভৃতি ক্ষেত্রের মানুষরা উপস্থিত ছিলেন। বেকারি বিরোধী আন্দোলন তীব্র করার উদ্দেশ্যে কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গঠিত হল অল ইণ্ডিয়া আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটি, যার সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কুমার (দিল্লি) এবং সর্বভারতীয় সভাপতি এম উমাদেবী (কর্ণাটক) সহ চব্বিশটি প্রদেশের সংগ্রামী যুব নেতৃবৃন্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে কমিটি।

প্রকাশিত হয়েছে
সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ
জুলাই ২০২১

এই সংখ্যায়
- আমাদের জীবনে ৫ আগস্ট
- আন্তর্জাতিক সঙ্গীত রচনার প্রেক্ষাপট
- প্যারি কমিউনের দেড়শো বছর
- চীনের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com